পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ

পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

একদিকে বামফ্রন্টের রাজনীতি, আরো নির্দিষ্ট করে বললে সিপিআই(এম) দলের রাজনীতি। অন্যদিকে বিরোধী রাজনীতি, বিরোধিতার রাজনীতি শাসক রাজনীতি কেন্দ্রীভূত। বামফ্রন্টের মধ্যে একটি দল সিপিআই (এম)-এর দলীয় শাসন। দলের সর্বোচ্চ কতিপয় নেতার দ্বারা নীতি নির্ধারণ, রাজ্য শাসন। বিরোধী রাজনীতি কিন্তু বহুমুখী। বহু দল, গোষ্ঠী, ডান, বাম, এনজিও থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজের বহুতর নামী - অনামী ব্যক্তি ও সমষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে তা বিস্তৃত নিম্নবর্গের বিপুল জনরাশির মধ্যে। শাসক রাজনীতির ভিত্তি প্রশাসন ও প্রশাসনিককতা। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রশাসনের মধ্যে ধরে নিতে হয় শাসক দলের সমান্তরাল শাসনকে। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনীতির ভিত্তি নিম্নবর্গের শাসিত মানুষ। নির্যাতিত মানুষ। শাসক দল ও সরকারের বিরুদ্ধে যাদের ক্ষোভ উৎসারিত হয় ফল্গুধারার মতো, কখনও কখনও যা বিস্ফোরিত হয় ভিসুভিয়াসের মতো।

এদেশে ক্ষমতা স্বতঃই কেন্দ্রীভূত। শাসক দল বা বিরোধী দল—সর্বত্রই ক্ষমতা মুষ্টিমেয় নেতা বা নেত্রীর কুক্ষিগত। আবার প্রতিটি দলই জনগণের মধ্যে নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সচেষ্ট। শাসন - ব্যবস্থা বা দলগুলো যতই উল্লম্বভাবে পরিচালিত হোক, শুধুমাত্র কতিপয় নেতা কিন্তু শাসন চালাতে পারে না। ওপরের তলার অল্প কিছু নীতি - নির্ধারণকারী নেতা ও নীচুতলায় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে তাই প্রয়োজন পড়ে দলীয় সংগঠনের, পার্টি, গণসংগঠন ও সমর্থকদের এক বিপুল নেটওয়ার্কের। এই নেটওয়ার্ক যত মজবুত হবে, যত বিস্তৃত হবে, দলের ক্ষমতা, ক্ষমতায় থাকা, ক্ষমতায় ফিরে আসা তত সুনিশ্চিত হবে, নেতাদের নীতি মানুষকে গেলানোর কাজ তত মসৃণ হবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সিঙ্গুর - নীতি, নন্দীগ্রাম - নীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচার শুরু করে দেয় বিশাল ক্যাডার - বাহিনী। পাশাপাশি, প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে বিরোধী - দলনের কাজও চলে। আর প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা বিতরণের মধ্যে দিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সংহত করার প্রক্রিয়া চালু থাকে। শাসক এবং বিরোধীপক্ষের সব দলই এই দলতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক হলেও, নীতি নির্ধারণে দু'পক্ষের থাকে পৃথক বাধ্যবাধকতা।

শাসক দল চলিত ব্যবস্থার রক্ষক, যে ব্যবস্থা বিশ্বপুঁজির সেবায় নিয়োজিত। শাসক দলের কর্তব্য - কর্ম নির্ধারিত হয় বৃহৎ পুঁজি তথা বিশ্বপুঁজির নিয়ম - নীতি - স্বার্থ দ্বারা, এটাই তার বাধ্যবাধকতা। আর পুঁজি যেহেতু কেন্দ্রীভূত ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকেও গিলে খেতে থাকে যেহেতু তার অস্তিত্বের শর্ত, তাই পুঁজি চালিত সরকারের নীতিও কেন্দ্রীভূত, আগ্রাসী ও নিপীড়নমূলক না হয়ে পারে না বামফ্রন্টকে তাই সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম ঘটাতে হয়।

বিরোধী পক্ষের থাকে অন্য বাধ্যবাধকতা। প্রধানত জনগণের মধ্যে সংগঠন ও সমর্থনের জোর বাড়িয়ে ক্ষমতা দখল করা, সেই লক্ষ্যে সংগঠন ও সমর্থনের ভিত ক্রমাগত প্রসারিত করা। এই কাজে জনগণের সমস্যাগুলিকে কাজে লাগানো। বিশেষ করে, জনগণ যেসকল বিষয় নিয়ে আলোড়িত - আন্দোলিত হচ্ছে, সেগুলিকে সংগঠিত করা, নেতৃত্ব দেওয়া এবং এইভাবে শাসক দল বা ফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে নিজেদের দল/ ফ্রন্টকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা। তার মানে এই নয় যে, বিরোধী পক্ষ মানুষের সমস্যা নিয়ে আন্তরিকভাবে আন্দোলন করবেই বা গণস্বার্থে শেষ পর্যন্ত অটল থাকবেই। বরং প্রধান বিরোধী দলগুলো সাধারণত সরকার ও শাসক দলের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ জনতার বিক্ষোভ - বাষ্প নির্গত হওয়ার সেফটি - ভাল্‌ভ হিসাবে কাজ করে থাকে। এবং এইভাবে চলতি ব্যবস্থা রক্ষায় শাসক দলের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে মাত্র। সেই অর্থে শাসক ও বিরোধী দু'য়ে মিলে আবার একটাই পক্ষ— রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংগঠিত রাজনীতি। নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতি এরই অপর পক্ষ।

এই অপর পক্ষ, যারা সংখ্যায় বিপুল, স্থানে বিস্তৃত, তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করেই চালিত হয় শাসক ও বিরোধী পক্ষের নানান চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাবাজি আর জনপ্রিয় কর্মসূচী। সংগঠিত রাজনীতি এই অপর পক্ষের কোনও সচেতন ভূমিকার কথা সাধারণত স্বীকার করেনা। জনগণ নিজেদের ভাল নিজেরাই বুঝতে পারেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই ঠিক করতে পারেন, এমন বিশ্বাস তাদের নেই। জনগণকে সে অধিকার দিতে (আপন ভাগ্য নির্ধারণ করার) তাদের ঘোর আপত্তি। এটা যেন সংগঠিত রাজনীতিব প্রতিপক্ষ। সংগঠিত দল-নেতা-ইস্তেহার-কর্মসূচির এক প্রকার অস্বীকৃত (negation)। জনগণ যদি নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন, তাহলে আর দলগুলোর প্রয়োজন কী? তাই মূঢ় জনগণকে প্রগতির পাঠ দিতে এত আয়োজন। গ্রামের মানুষ শিল্পায়নের সরকারি প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও, নেতাদের গলায় গভীর প্রত্যয়, 'মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিল্পায়ন করতে হবে'। মানুষ নিজেদের ভালো বুঝছেন না কেন? সেখানেও নেতাদের সহজ উত্তর, 'ওদের ভুল বোঝানো হচ্ছে'।

অর্থাৎ এই অপর পক্ষটি, তার মধ্যে শহরের বুদ্ধিজীবী থেকে গ্রামের ভূমিহীন মানুষ সবাই পড়েন, যারাই কিনা ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থেকে নিজেদের বিদ্যে - বুদ্ধি - সক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন ও জীবন - যাপনের জন্য সংগ্রাম চালান, তারা যেন রাজনীতির ক্ষেত্রে কেউ নয় (non -entity)। নন্দ্রীগ্রাম ফেরত শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের ওপর ক্যাডার - হামলার সাফাই গাইতে গিয়ে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী কয়েকমাস আগে বললেন যে, শিল্পী-সাহিত্যিক যারা তিনমাস ধরে নন্দীগ্রাম-নন্দীগ্রাম করছেন, তারা তো রাজনৈতিক কর্মীর মতো কাজ করছেন, তাদের হেনস্থা করে তাই ঠিকই করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজনীতি করবেন নেতারা। তাদের নির্দেশমতো শিল্পীরা ভোটের প্রচারে এক-আধদিন শোভাবর্ধন করবেন; জনগণ মিছিলে, মিটিং-এ ভিড় করবেন, এমনকি বিরোধীদের মেরে খুন করে আসবেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না।

এমন ধারণা শুধু যে প্রধান শাসক দলের মধ্যেই রয়েছে, এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। এরাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রীও চান, তাঁর ছত্রছায়ার যাবতীয় বিরোধিতা সংহত হতো, যাতে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর ও তাঁর দলের ক্ষমতায় যাবার পথ সুগম হয়। জনমানসে মেন একটা ধারণা সেই উপনিবেশিক আমল থেকেই চালু করা হয়েছিল যে, রাজনীতি সর্বসাধারণের জন্য নয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষিত অভিজাতরা—সুভাষ বোস বা জ্যোতি বোসের মতো উচ্চশিক্ষিতরা তাই সহজেই নেতৃত্বের পদে আসীন হয়েছেন, কি কংগ্রেস কি কমিউনিস্ট দলে। অল্পশিক্ষিতরা, বিশেষত নিম্নবর্ণের কিংবা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা, পার্টিতে আঞ্চলিকভাবে নেতা বা (সংরক্ষণের সুবাদে) এমএলএ-এমপি বা এমনকি মন্ত্রী হলেও, পার্টির নীতি - নির্ধারক অবস্থানে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিতদের দাপট অব্যাহত থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামস্তরে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রবর্তন, তার নিয়মিত নির্বাচন, প্রশাসনিক সুযোগ - সুবিধা বিতরণের বহু দফা

কর্মসূচির রূপায়ণ এবং এসব কিছু ঘিরে গত ৩০ বছরের দলতন্ত্রের প্রসার গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে রাজনীতির সাথে যেন আস্টে-পৃস্টে বেঁধে দিয়েছে। এমনকি দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবন - জীবিকার সংগ্রামও প্রভাবিত হয় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সম্পর্কের নিরিখে। ফলে, প্রত্যন্ততম গ্রামের মানুষও যুক্ত হয়ে যায় দলের সাথে, দলীয় রাজনীতির সাথে, হয় শাসক কোনও দল, নয়তো সেই এলাকায় যে শক্তিশালী বিরোধী দল আছে, তার সাথে। এইভাবে রাজনীতির অপর পক্ষটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বা খানিকটা যেন ঢাকা পড়ে যায় শাসক পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্ব - সংঘাত ও টানাপোড়েনের মধ্যে। আপাতভাবে মনে হয়, শাসক এবং বিরোধী পক্ষই বুঝি রাজনীতির আসল নায়ক, জনগণ শুধুমাত্র দাবার বোড়ে।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই নিম্নবর্গের উত্থান রাজনীতির জগতে প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। প্রচলিত ছক উলটে-পালটে দিয়ে জনগণ স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন। যেমন কিনা, ইদানিংকালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে হয়েছে। গণ -উত্থানের ঠেলায় মাত্র এক বছ আগে বিপুল আসনে জিতে আসা একটা সরকার কেমন যেন নাজেহাল হয়ে পড়েছে। কার্যত শাসক এবং বিরোধী দু'পক্ষকেই কৃষক আন্দোলন চরম অপ্রস্তুত অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। বাস্তবত, কোন পক্ষই নির্বাচনের ঠিক পরেই এমন একটা কৃষক উত্থানের সম্ভাবনা পূর্বানুমান করতে পারেনি। সুতরাং এই অপর পক্ষকে বাদ দিয়ে রাজ্য রাজনীতির কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

দুই

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির একটা ঐতিহ্য আছে, বিরোধিতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ঐতিহ্যকে এককথায় বলা যায় বামপন্থা, যার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠান - বিরোধিতা শুধুমাত্র শাসক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার মধ্যে যা সীমাবদ্ধ থাকেনি। এবং বিরোধীর রাজনীতির মধ্যেকার প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বকেও তারা বারবার প্রশ্ন করেছে, বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে বিরোধী পক্ষের কায়েমি নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও। ঔপনিবেশিক আমলে মূল ধারার প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়স্তরে বিদ্রোহের ধজা উড়িয়েছিলেন সুভাষ বোস। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতির প্রবল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই বঙ্গ দেশেই। বিরোধী রাজনীতির অপর ধারা হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে।

এই সময়ে সংগঠিত রাজনীতির বাইরে অপর পক্ষ হিসাবে নিম্নবর্গের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিশেষ বিশেষ সময়ে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কিছু অঞ্চলে নেতৃত্বের নির্দেশ ছাপিয়ে কৃষক বিদ্রোহ গণঅভ্যুত্থানের চেহারা নিয়েছে। ১৯৪৬ -পরবর্তী যে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়, সেখানেও কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশিকাকে বহুগুণ ছাপিয়ে আন্দোলন সশস্ত্র মুক্তির আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। সংগঠিত রাজনীতির সীমানার মধ্যেই এভাবে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে নিম্নবর্গের নিজস্ব আশা - আকাঙ্ক্ষা, স্বকীয়তা-সচেতনতা এবং সর্বোপরি তার নিজস্ব বিরোধিতার পদ্ধতি। এছাড়াও বাংলার ইতিহাসে (প্রধানত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে) নিম্নবর্গের একেবারে নিজস্ব সংগ্রামের ইতিহাসও কম নয়, সংগঠিত রাজনীতির বিকাশের সাথে সাথে যা ক্রমশই বিরল হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ মূলত কংগ্রেসি শাসনের পর্ব। এই সময়কালে বিরোধিতার মূল ধারার নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকতা ও আপসকামিতার বিরুদ্ধে লড়াই থাকে অব্যাহত। যার পরিণতিতে ১৯৬৪ সালে একবার এবং ১৯৬৭ সালে আরেকবার পার্টিতে বড়ো আকারের ভাঙন দেখা দেয়। নকসালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পটভূমিতে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় ভাঙনটি সংগঠিত রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত পার্টি নেতৃত্বকেই নয়, প্রতিষ্ঠিত সকল ধ্যান-ধারণা, প্রচলিত সকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হয়। প্রতিষ্ঠান - বিরোধী মানসিকতার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে মূর্তি ভাঙা ও স্কুল পোড়ানোর মত কাজকর্মে। অন্যদিকে দু'দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয় 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার' এই শ্লোগান তুলে। প্রাথমিকভাবে, এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শাসিত অংশের শ্রেণীসংগ্রাম গতিবেগ পায়। যথারীতি তা দলীয় সীমা ছাড়িয়ে নিম্নবর্গের নিজস্ব ঢংয়ে ফেটে পড়ে (যেমন, শ্রমিক আন্দোলনে ঘেরাও জনপ্রিয় হাতিয়ারে পরিণত হয়) কিন্তু গণসংগ্রামের জোয়ারকে কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব পার্টি বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে দলীয় সংঘর্ষ বাড়াতে থাকে। এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কমবেশি সমস্ত দল। এই সুযোগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বৃদ্ধি করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রাজ্যের ওপর তার হৃত কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করে। ১৯৭০ থেকে' ৭৭ সময়কালটিই এই রাজ্যের রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়।

১৯৭৭ পরবর্তী অধ্যায়টি আমাদের মূল আলোচনার বিষয়। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি, প্রতিষ্ঠানপন্থী তথাকথিত 'বাম' দলগুলোর শাসনক্ষমতায় অরোহণ এবং তাদের সুদীর্ঘ শাসন। তাদের এই শাসনকালে বিরোধী রাজনীতির অত্যন্ত ছন্নছাড়া এক অবস্থা। বিরোধী রাজনীতির প্রধান দল কংগ্রেসে ভাঙন এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের আবির্ভাব। বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভের বিষয়গুলো ধরে এবং সরকারি অপশাসন ও অন্যায় - অত্যাচারের বিরোধিতা করার মধ্যে দিয়ে জনমানসে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে নিজেদের আরো আরো বিভাজন ও ছোট ছোট এলাকায় সীমিত কর্মকান্ডে আটকে পড়া। রাজ্য-রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী পক্ষ। জনগণের ক্ষোভ - বিক্ষোভ-আন্দোলনের 'স্বাভাবিক' প্রতিনিধি।

এই প্রসঙ্গে সংগঠিত রাজনীতির দ্বিতীয় তথা বিরোধী পক্ষের সাথে অসংগঠিত নিম্নবর্ণের রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কটা নিয়ে আলোচনা দরকার। রাজনীতিতে জনসাধারণের স্বকীয় ভূমিকা স্বীকার না করলেও, শাসক বা বিরোধী সকল পক্ষের রাজনীতিই দাঁড়িয়ে থাকে জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের ওপরে। অর্থাৎ প্রতিটি দলই যেন শাসন ক্ষমতা চালাতে চায় বা ক্ষমতায় যেতে চায় জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত তাদের দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য। প্রতিটি দলেরই দাবি, জনগণের ভালো তারাই সবচেয়ে ভালো বোঝে এবং তারাই ক্ষমতায় গিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে জনগণের মঙ্গল করতে পারবে, এবং এটাই তাদের রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র কারণ। লক্ষ্য করুণ, টাটা বা সালেমদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজ্যসরকার যখন কৃষকদের মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, তাদের ধনে - প্রাণে মারার আয়োজন করছে এবং কৃষকেরা বাধা দিলে গণহত্যার পথ গ্রহণ করছে তখনও কিন্তু সরকারি নেতারা 'জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্যই' এসব করছেন বলে দাবি করে চলেছেন।

এই মঙ্গলসাধনের জন্য 'উন্নয়ন' নামক এক রঙীন স্বপ্ন ফিরির ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের গরীব-গুর্বো জনসাধারণের সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য নয়া উপনিবেশিক টোটকা ছিল 'উন্নয়ন'। তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারকে রোখার জন্য কার্যকরি হাতিয়ার হতো সংসদীয় নির্বাচন ও প্রশাসনিক উন্নয়ন। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো এই দুটোর মেলবন্ধন ঘটানো। এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে গ্রামস্তরে মানুষের অংশগ্রহণ। বিশ্বপুঁজির কর্তাব্যক্তিরা দেখলেন, তাদের নয়া -উপনিবেশিক শোষণ-শাসন বজায় রাখতে এটাই সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানায় এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলছে দেখে তারা মুগ্ধ হলেন এবং বামফ্রন্টের

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

জনসাধারণকে লক্ষ্যবস্তু (object) করে এই যে প্রশাসনিকতার কর্মসূচি, সাধারণ অবস্থায় মানুষ তার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু পার্টির মাধ্যমে প্রশাসনিকতার সুফল বন্টিত হয়, তাই মানুষ নিজ জীবন-জীবিকার স্বার্থে তার সম্প্রদায়ের স্বার্থে বা এলাকার স্বার্থে প্রশাসনিকতার সুযোগ - সুবিধা যতটা সম্ভব আদায় করে নিতে পার্টিগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কেউ শাসক পার্টির সাথে, কেউ বা বিরোধি দলের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন, শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগান। এমনকি, একই দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা নেতার মধ্যে দ্বন্দ্বকেও নিজদের স্বার্থে কাজে লাগাতে শেখেন।

নিজেদের দাবি - দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সময়ও নিম্নবর্গের মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। সংগঠিত দল বা দলীয় নেতার সাহায্য ছাড়া তাদের আন্দোলন যে বেশিদূর এগোতে পারবেনা, তা তারা বোঝেন। প্রশাসনিকতার সুযোগ - সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে শাসিত মানুষ যেমন সাধারণ স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্ক করেন, তেমনি দাবি-দাওয়া আদয়ের ক্ষেত্রে তারা বিরোধী দলের খোঁজ করেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নিদিষ্ট অবস্থায় সংগঠিত রাজনীতির সাথে নিম্নবর্গের একটা জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেখানে নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দু'পক্ষই দু'পক্ষের ওপর নির্ভর করে। দুই পক্ষই একে অপরকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। সংগঠিত দলগুলো, বিশেষত আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী দলগুলো (পশ্চিমবঙ্গে একেক একলাকায় একেক দলের আধিপত্য, দক্ষিণবঙ্গে যেখানে সিপিএম দলের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য, উত্তরঙ্গের অনেক জায়গায় এই দলটিই বিরোধী পক্ষ), সাধারণভাবে জনগণের ওপরে আধিপত্য করলেও বিশেষ বিশেষ সময়ে মানুষের বিক্ষোভ - আন্দোলন দলগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। যেমন, নন্দীগ্রামে একটা বিশেষ ব্যবস্থায় ওখানে এতদিনকার আধিপত্যকারী দল সি পি এম -এর অস্তিত্বই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি তাই শাসক, বিরোধী ও অসংগঠিত নিম্নবর্গ এই তিনপক্ষের জটিল আন্তঃসম্পর্কের যোগফল।

তিন

১৯৭৭ -পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে লক্ষণীয়ভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঐতিহ্যটি দুর্বল হলো। এর কারণ বহুবিধ। ৭৭ -এর পূর্বে শাসক কংগ্রেস দল আর ভারতরাষ্ট্র প্রায় সমার্থক ছিল (তত্ত্বগতভাবে নয়, জনচেতনায়)। ৭৭-এর পরবর্তী পর্বে রাজ্যে এক শাসক তো কেন্দ্রে আরেক। রাজ্যে যে বিরোধী, কেন্দ্রে সে-ই শাসক। রাষ্ট্রের সাথে সংগঠিত রাজনীতির সম্পর্কটি হলো জটিল! বহুবর্ণময়। বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা, নিয়মিত সংসদীয় নির্বাচন (পঞ্চায়েতসহ বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচন বছর না ঘুরতেই), ও সর্বোপরি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রশাসনিকতার বিস্তার রাষ্ট্র - বিরোধী চেতনাকে অনেকটা ঝাপসা করে দিল। এর সাথে যুক্ত হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বামপন্থার অবক্ষয়। পুঁজিবাদের বিকল্প ভাবনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সবক্ষেত্রেই জনগ্রাহ্য কোনও রূপরেখার অভাব।

এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতিতে যুক্ত হলো বামফ্রন্টীয় প্রশাসনিকতা, পার্টিতন্ত্র ও কূটনীতির সূচারু সমন্বয়। প্রশাসনিকতা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। বাকি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা দরকার। গত ৩০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পার্টিতন্ত্রের সমান্তররাল শাসনের বিষয়টি আজ অল্পস্বল্প হলেও আলোচনায় আসছে। এবিষয়টি না বুঝলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিই অধরা থেকে যাবে। প্রশাসনিকতার সুযোগ - সুবিধা বন্টনকে ঘিরে গ্রামবাংলায় দলবাজির কথাও খুব অজানা নয়, কিন্তু একেবারে গ্রামস্তরে শাসক পার্টি তার গণসংগঠন, প্রশাসন ওপ্রশাসনিকতাকে ব্যবহার ক'রে কীভাবে গ্রামসমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে তার কলাকৌশল জানা না থাকলে (সব গ্রামে এর প্রয়োগ আবার একরকম নয়), তার বিরোধিতা ক'রে গ্রামে কিছুই করাই প্রায় সম্ভব না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রধানত সি পি এম দলের একচ্ছত্র আধিপত্য ভাঙতে না পারাটাই যে বিরোধী দলগুলোর সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা, এ বিষয়ে বোধহয় খুব বিতর্ক নেই।

এই নিবন্ধে পার্টিতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, সাধারণভাবে এই পাটিতন্ত্র গ্রামীণ গরীব মধ্যবিত্ত ধনীদের একাংশের সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে বিরোধী শক্তির উত্থানের যে কোন প্রয়াসকে নির্মমভাবে দমন করে। পার্টিতন্ত্র পঞ্চায়েত মারফত অনুদান বিতরণকে কঠোরভাবে পার্টির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে। গরীব শ্রমজীবী মানুষদের দৈনন্দিন জীবন - জীবিকার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ক'রে তাদের বাধ্য করে পার্টির পক্ষে দাঁড়াতে। পার্টিতন্ত্র প্রতিটি ব্যক্তির গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে, এবং যে কোন বিরোধী সমাবেশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পার্টিতান্ত্রিক শাসন প্রধানত সি পি এম দলের বৈশিষ্ট্য হলেও গ্রামাঞ্চলে অন্য দলগুলিও (বামফ্রন্টে শরিক ও প্রধান বিরোধীরা) নিজ নিজ সামর্থ্যের এলাকায় পার্টিতান্ত্রিক শাসন চালাবার চেষ্টা করে।

এর সাথে মূলত শহরাঞ্চলের বামফ্রন্ট একধরনের কূটনীতি চালায়। যার প্রধান লক্ষ্য হলো, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার প্রসাদ বন্টন, তাদের অন্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে নিয়মিত লেনদেন ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি করা এবং এইভাবে বিরোধিতার শক্তিকে অন্তর্ঘাত করা। পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে বহু (সম্ভবত বেশিরভাগ) নেতার সাথে বামফ্রন্টীয় এই লেনদেনের সম্পর্কটি বহুদিনের। তাদের অনেকেই প্রকাশ্যে বামফ্রন্টের বিরোধিতা করলেও মনে মনে বামফ্রন্টের শাসনই চান। তারা কোন আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলে ফ্রনট নেতারা তার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকেন। এরা কোনও আন্দোলনকে শেষ অবধি টেনে নিয়ে গেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা অবশ্য তাদের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও বটে।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যত যে অনুজ্জ্বল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সিঙ্গুর আন্দোলন দিয়েই ধরা যাক। আন্দোলন চলাকালীন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস ও এসইউসিআই নেতারা কৃষকদের নিয়ে কৃষি জমি রক্ষা কমিটি বানিয়েছিলেন। সেই কমিটিতে কৃষিজীবী মানুষেরই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে তৃণমূল নেত্রীর হস্তক্ষেপে এই কমিটিটিকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' গঠন করা হলো রাজ্যস্তরের নেতাদের নিয়ে এবং আন্দোলন সিঙ্গুর থেকে তুলে আনা হলো কলকাতায়। স্থানীয় মানুষের ভূমিকা প্রায় বাতিল করে দিয়ে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হলো তৃণমূল নেত্রীর অনশনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে সিঙ্গুরের জমি পুলিশ গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। কৃষকরা খানিক প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও তৃণমূল নেতারা পুলিশের সাথে সংঘাত এড়াবার লাইন নিয়ে চলেছেন। কৃষকদের যে কোনও আন্দোলনের আগাম খবর পুলিসের কাছে তৃণমূল নেতারাই পৌঁছে দিতেন। পুলিশের সাথে সংঘাতে গিয়ে জমি রক্ষা করা যাবে, এ বিশ্বাস তাদের কোনকালে ছিল না। তৃণমূল নেত্রী তার

দলের দুই কলকাতার নেতাকে সিঙ্গুর আন্দোলনের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, যাদের কৃষক স্বার্থ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না, দায়বদ্ধতাও ছিল না। ফলে, সিঙ্গুরে বিপুল সংখ্যক কৃষকের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোনও শক্ত প্রতিরোধ দানা বাঁধলো না। রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণের সময়ও কৃষকরা তৃণমূল কংগ্রেসর নেতৃত্বের আশায় থেকে পথে বসেছিলেন।

নন্দীগ্রামে কৃষকদের অদম্য প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতিকে আবার চাঙ্গা করেছে। সরকার এবং প্রধান শাসক দল বিপাকে পড়লো। শিল্পী - সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবী ও জনগণের বিভিন্ন অংশের বামফ্রন্টের বিরোধিতা তীব্র হয়ে উঠলো। কৃষকদের এই নবোত্থিত প্রতিরোধ আন্দোলনই বিরোধী রাজনীতির ভরসা হয়ে উঠলো। কিন্তু বিরোধী শিবিরের অবস্থা? একই রকম অগোছালো এবং নেত্রীনির্ভর। ততদিনে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমি রক্ষা কমিটিতে অনেকেই যোগ দিয়েছেন, শেষপর্যন্ত কংগ্রেসও যোগ দিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সিপিএম বিরোধী সকল শক্তিকে এই কমিটিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অনেক বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী এখন সকল বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে সিপিআই (এম) দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথা বলছেন। কিন্তু সে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার শর্ত যদি হয় মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্ব তবে তা কেমন হবে এবং কতদিনই বা টিকবে? পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমি রক্ষা কমিটির একটি লিফলেট দেখা গেলে যার শিরোনাম ''রাজ্যবাসীর কাছে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আবেদন : জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হোন'' যেখানে বলা হয়েছে—

''জোর জবরদস্তি করে কৃষক পরিবারগুলোকে পথে বসিয়ে, তাদের জীবন - জীবিকার অধিকার কেড়ে নিয়ে সুজলা - সুফলা হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষ সোচ্চার প্রতিরোধে ফেটে পড়েছেন। শহরের মানুষ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গড়ে উঠেছে 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দলমতনির্বিশেষে গড়ে উঠেছে এই কমিটি। মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এখানে যুক্ত হয়েছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেশ কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন ও গোষ্ঠীর নেতা।'' (জোর মূল প্রচারপত্রে)

একটা ব্যাক্তির নেতৃত্বে একটা দল চলতে পারে, কিন্তু একটা জোট কিভাবে চলবে তা বুদ্ধির অগম্য। বিশেষত, যেখানে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সকলেই আছেন, বা সকলকেই আহ্বান করা হচ্ছে। আসলে, এই বিরোধী নেত্রী বা তার দলবল প্রধানত শাসক দলের থেকে কম স্বৈরাচারী নয়, তাই এই বিরোধী নেত্রীর সামনেই ধর্মতলায়, কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সভা চলাকালীন নেত্রীর দলবল যখন একটি সরকারপন্থী চ্যানেলের মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থা করে, নেত্রী অম্লানবদলে মঞ্চ থেকে বলে দেন, যারা গন্ডগোল পাকাছে তারা সব সিপিএম -এর লোক, গণতন্ত্র যার হাতেই লাঞ্ছিত হোক, তার বিরোধিতা না ক'রে যদি বামপন্থীরাও বিশেষ নেতা বা নেত্রী-পন্থী হয়ে পড়েন, তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত যে অন্ধকার, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে ১৬ দলের এক জোট তৈরি হয়েছে, যে জোট স্পষ্টতই সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখে গড়া হয়েছে। জোটের কোনও সামাজিক - অর্থনৈতিক কর্মসূচি আছে কিনা জানা যায়নি। সিপিএমকে পরাস্ত করে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য নেত্রী ঘোষণা করেছেন। একমাত্র তাঁর নেতৃত্বেই যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার (কংগ্রেস আমলে যেমন ছিল!) হতে পারে একথা প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। বামফ্রন্ট যদি একদলীয় শাসনে ক্লিষ্ট হয়, তাহলে নবগঠিত এই জোট কিভাবে এক ব্যক্তির আধিপত্য সহ্য করবে, কে জানে!

চার

এই অবস্থায় রাজনীতিতে অপর পক্ষ তথা নিম্নবর্গের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল আসনে জয়লাভের ঠিক পরপরই যে সরকারের এমন একটা সংকটকালীন অবস্থায় পড়তে হলো, ৩০ বছরে এই প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত জাগ্রত হলো, এমনকি ফ্রন্ট শরিকদের সাথে সিপিএম -এর দ্বন্দ্ব যেভাবে প্রকাশ্যে ঘনীভূত হলো, এসব কিছুর পেছনে নায়কের ভূমিকায় কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষিজীবী মানুষ। কৃষক আন্দোলনই বিরোধী দলগুলোকে চাঙ্গা করে দিলো। শুধু তাই নয়, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতেও একরকম বাধ্য করলো। কৃষক আন্দোলন সরকারের মুখোশ খুলে দিয়ে রাজ্যজুড়ে বিরোধিতার নতুন হাওয়া, নতুন মেরুকরণের সূত্রপাত করলো। প্রবল প্রতাপশালী বামফ্রন্ট সরকার এতদিনে যেন তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হলো। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী যে কৃষক আন্দোলন ছাড়া আর কেউ নয়, তা তো একেবারেই স্পষ্ট।

৩০ বছর ধরে বিরোধীরা যা করতে পারেনি, কৃষক আন্দোলন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তা করতে পেরেছে। গ্রামবাংলার কিছু অঞ্চল থেকে পার্টিতন্ত্রকে সাময়িকভাবে হলেও উৎখাত করেছে। বামফ্রন্টীয় শাসনপদ্ধতির ভিতে আঘাত করেছে। ফলে, কৃষক আন্দোলনই আজ বিরোদী রাজনীতির ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং যথারীতি প্রধান বিরোধী দল এই আন্দোলনকে আত্মসাৎ করে পাল্টা পার্টিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সামাজিক চরিত্র নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। ইতিমধ্যে সিঙ্গুর আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টিতান্ত্রিক কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। নন্দীগ্রামের জীবন-মরণ সংগ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের চেষ্টা কত দ্রুত সিপিআই (এম)-এর অস্তিত্ব মুছে গিয়ে গোটা এলাকা তাদের দলীয় পতাকা দিয়ে মুড়ে ফেলা যায়। যদিও সিপিএম-এর সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর নন্দীগ্রাম পুনর্দখলের সুপরিকল্পিত আক্রমণের সামনে জনগণের প্রতিরোধে প্রথমেই এই দলের নেতাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। জনগণের প্রতিরোধের সুফল আত্মসাৎ করতে এই দলটি যতটা তৎপর, তা রক্ষা করতে তাদের আগ্রহ বোধ করি ততটাই কম।

এইভাবেই সংগঠিত বিরোধী পক্ষ অসংগঠিত বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব গ্রাস করতে চায়। এটাও কোন বিশেষ শাসক বা বিরোধী দলের বৈশিষ্ট্য নয়। সাধারণত দলমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হলো গণআন্দোলনের সুফলগুলো আত্মসাৎ করে দলীয় সংগঠন, দলীয় প্রতিপত্তির পুষ্টিসাধন। নিম্নবর্গের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য আসলে রাজনীতির প্রতিপক্ষ; সংগঠিত শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের কাছেই তা নিতান্ত এক 'অপর', এক বিরোধীপক্ষ — যাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজ নিজ স্বার্থে কাজে লাগানোই পার্টিগুলোর লক্ষ্য। এই কাজে দক্ষতা অর্জনের ওপর নির্ভর করে পার্টির বিস্তৃতি, পার্টি ভবিষ্যৎ। সংগঠিত বিরোধী রাজনীতি ও অসংগঠিত নিম্নবর্ণের রাজনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কটি তাই জটিল। আর এই জটিল আন্তঃসম্পর্কের ওপরেই প্রধানত নির্ভর বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ, বিরোধী রাজনীতির শাসক রাজনীতি হয়ে ওঠার প্রকল্পের ভবিষ্যৎ।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক রাজনীতির সাথে বিরোধী রাজনীতির আঁতাত ও সংঘাত এবং সংগঠিত দলীয় রাজনীতির নিম্নবর্গের রাজনীতির সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচিত্র শক্তির বিন্যাস তৈরি করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিরোধী শক্তির বিন্যাসে পরিবর্তন এনেছে, গতিময়তা এনেছে। এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে তার পূর্বানুমান সহজ নয়। তবে এটা বোধ হয় স্পষ্ট যে, গণসংগ্রামের চাপ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী শক্তির সমন্বয় বা শাসক রাজনীতির পরাজয় সম্ভব হবে না। অবহেলিত অপর পক্ষটিই শেষ বিচারে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে।